আদি শংকরাচার্য

গৌরী মিত্র

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন জনজীবনে সর্বময় কল্যাণের মূলে ছিল বেদ-বেদান্তের শিক্ষা। বেদ-বেদান্তের ধারা দীর্ঘদিন অব্যাহত থেকেছে। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে পরবর্তীকালে বেদ-বেদান্তের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা অনেকাংশে প্রতিহত হয়েছে। বিদেশি — ভিন্ন ধর্মীদের আগমন তথা প্রভাবে একসময়ে যে ধারা বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে যখন তখনই ভারতে অবতীর্ণ হয়েছেন আচার্য শংকর। দেশব্রতী শংকরের মহাবোধে প্রতীয়মান হয়েছিল যে— ভারতের সর্বময় কল্যাণের জন্যে বেদান্ত ধর্ম তথা শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনরায় উজ্জীবন করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজন মেটাতেই তিনি তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছেন। যাঁরা এখন ধর্ম তথা বেদ-বেদান্তের চর্চাকাজে যুক্ত তাঁরা অবশ্যই জানেন শংকরের প্রজ্ঞার কথা— তাঁর রচিত মূল্যবান সব গ্রন্থাদির বিষয়-কথা। প্রজ্ঞাবান শংকর ভক্তিনিষ্ঠ থেকে যে বিপুল শ্রম স্বীকার করে তাঁর লক্ষ্যপথে

এগিয়েছিলেন তার কথা সাধারণ মানুষের তেমন করে জানা নেই। হয়তো জানা আছে তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের দু চারটে বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথা।

শংকর নির্দেশিত পথের সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন উনিশ শতকের যুগমহান পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই তিনিও অদ্বৈত বেদান্তের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠ থেকে শংকরের মতোই সাকার-উপাসনা তথা ভক্তি পূজার প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আস্থা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর একান্ত ভক্ত-পার্ষদ স্বামী বিবেকানন্দও মেনেছিলেন শংকরের ভূমিকার সদর্থকথা তথা অদ্বৈত ব্রহ্মসত্য।

এ যুগের মানুষ জানেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির ভূমিকার ইতিবাচকতা। জানেন না অনেকেই এঁদের পথিকৃৎ-পথদ্রষ্টার কথা। পথিকৃৎ-পথদ্রষ্টা হলেন খ্রিস্টিয় নবম শতকের (৭৮৮-৮২০ খ্রিস্টাব্দ) ঐতিহাসিক মহাপুরুষ আচার্য শংকর। শংকর সময়ে উদ্যোগী না হলে হয়তো দেশের মাটি থেকে অদ্বৈততত্ত্ব-নির্দেশিত ঐক্য-সমন্বয়নীতি বিলুপ্ত হয়ে যেত।

শংকরাচার্যের জীবনকথা সর্বসাধারণ্যে বহুল প্রচার পেলে ইতিহাসকথার ধর্মীয় শিক্ষা সূত্রটি যথাযথ সুরক্ষা পাবে— এমন বোধেই একনিষ্ঠ থেকে বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার শ্রী শংকরীভূষণ নায়ক চেয়েছেন শংকর-জীবনী প্রকাশ করতে। আর তার ফলশ্রুতিতেই আমি সুযোগ পেয়েছি এ জীবনীগ্রন্থ লেখার।

এ জীবনীগ্রন্থে ভুলত্রুটি থাকলে পাঠকজনের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। গ্রন্থ পড়ে পাঠকজন উপকৃত হলে আমি ধন্য।

১৫.১২.২০১৩ গৌরী মিত্র

॥ এক ॥

'প্রতিটি জাতির আধ্যাত্মিক জীবনেই পর পর উত্থান ও পতন এসে থাকে। জাতির পতন হয়, মনে হয় সবকিছুই যেন ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু আবার সেই জাতি শক্তি সংগ্রহ করে, আবার তার উত্থান হয়। জাতির জীবনে নবজাগরণের মহাতরঙ্গ আসে, আর সেই তরঙ্গের শীর্ষদেশে সবসময়ই বিরাজ করেন একজন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ, ঈশ্বরের একজন বার্তাবহ।... সেই মহাপুরুষ তাঁর প্রবল শক্তি সমাজের উপর প্রয়োগ করেন... এঁরাই জগতের মহান চিন্তানায়ক, প্রেরিত পুরুষ, মহাজীবনের বার্তাবহ— ঈশ্বরের অবতার।'

(স্বামী বিবেকানন্দ)

সূচনায় উপস্থাপিত স্বামী বিবেকানন্দের ভাষ্যের 'জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ', 'মহান চিন্তানায়ক' ইত্যাকার বিশেষণ—উপাধিগুলো এই জীবনী গ্রন্থের আলোচ্য চরিত্র শংকরাচার্য সম্পর্কে সঠিক মাত্রায় প্রযুক্ত। কারণ ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত আচার্য শংকরের মহান

ভূমিকায় সনাতন হিন্দুধর্মের পুনঃজাগরণ ঘটলে ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক জীবনের পুনরায় উত্থান ঘটেছিল।

সনাতন হিন্দুধর্মের মূলকথা আধ্যাত্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা নামক সম্পদটি বিনষ্ট হলে জাতির জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। হিন্দুধর্মে আধ্যাত্মিকতার সূচনা ঘটেছিল ঋষিযুগে। সে যুগের অপৌরুষেয় গ্রন্থ 'বেদ' হল আধ্যাত্মিক সত্যের ভাণ্ডার। তপোবনের ঋষিদের হোমযাগযজ্ঞ, ধ্যান-উপাসনা ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মের মূলে ছিল আধ্যাত্মিকতা। যা তাঁদের মনকে সমৃদ্ধ করে জগৎ তথা সর্বজীবকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল, ঋষিযুগের ধর্ম তথা আধ্যাত্মিক জীবন চিরকালীন স্থায়িত্ব পায়নি। ঋষিযুগের পরে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের স্বার্থান্বেষী কাজকর্মের পরিণামে জাতি তথা হিন্দু-জনজীবন থেকে হারাতে শুরু করেছিল আধ্যাত্মিকতা নামক মহান সম্পদটি। মহান সম্পদটি এরপর তথাগত বুদ্ধের (আনুমানিক ৫৬৩-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ভূমিকায় ফিরে পেয়েছিল আপন মহিমা। বুদ্ধের প্রদর্শিত পথের মূলকথা— অহিংসা। শীল, সংযমপালন ইত্যাদির উদ্দেশ্য হল প্রেম-ভালোবাসা, সর্বজীবে দয়া। সবই আধ্যাত্মিকতার ফলশ্রুতি।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— বুদ্ধ সাম্যের আচার্য... পুরোহিত ও অন্যান্য বর্ণের ভেদ তিনি দূর করেছিলেন।

দুঃখের কথা— ভারতের মাটিতে বুদ্ধের আদর্শ তথা ধর্ম স্থায়িত্ব পায়নি। বুদ্ধের সমকালে ও তাঁর পরবর্তীকালে সম্রাট অশোকের (আনুমানিক ২৭৩-২৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজত্বকালে যে বুদ্ধধর্ম ভারত; ভারত পেরিয়ে আরও দূর দেশে প্রসার পেয়েছিল সে বুদ্ধধর্মের মহিমা ক্ষুণ্ণ হতে শুরু করেছিল। অবিবেচক, স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষের ভূমিকাতেই এ ধর্মে দেখা যায় শ্রেণিবিভাজন। দেখা যেতে শুরু করে পরিবর্তন-বিবর্তন। যার ফলশ্রুতিতে ধর্মের সনাতনতা তথা আধ্যাত্মিকতার বিলুপ্তি ঘটতে শুরু করে।

বুদ্ধ-পরবর্তী যুগ— তন্ত্রমন্ত্রের যুগ। বিপথগামী বৌদ্ধরা যেমন, হিন্দু শাক্ত উপাসকরাও তেমনই এ যুগে মেতে উঠেছিল তান্ত্রিক পুজোপাঠে। আচার-বিচার সর্বস্ব তান্ত্রিক পুজোপাঠে আধ্যাত্মিকতার বিন্দু-বিসর্গও ছিল না। আধ্যাত্মিকতার বিলুপ্তি অর্থাৎ বৈদিক তথা সনাতনধর্মের বিলুপ্তি। যুগের এই পতনকালে ভারতে আবির্ভাব ঘটেছিল শংকরাচার্যের (আনুমানিক ৭৮৮-৮২০ খ্রিস্টাব্দে)।

আধ্যাত্মিকতার মূলে রয়েছে বেদ-বেদান্ত-কথিত অদ্বৈততত্ত্ব। এ তত্ত্বের পুনরুদ্ধারকাজে শংকর নিয়েছিলেন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা। তাঁর কাজ খুব সহজসাধ্য ছিল না। তাঁর সমকালে বৌদ্ধ যেমন হিন্দু ধর্মেও তেমনই দেখা গিয়েছিল সম্প্রদায়গত নানান বৈষম্য-বিভাজন। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর এক ভাষ্য থেকে জানা যায় যে জগন্নাথ দেবের "মধ্যে সমন্বয় হয়েছিল শবর জাতির টোটেম উপাসনা, বৌদ্ধ ত্রিরত্ন, পূর্ব উপকূলে পূজিত নৃসিংহ এবং পশ্চিম উপকূলে পূজিত— কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রা। নতুন পূজার সঙ্গে নতুন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, কখনও নতুন Caste-র জন্ম হয়েছে। মুক্তি বা মোক্ষ আর আগের অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। অনেক সময় ব্রাহ্মণদের প্রতিরোধ ঠেকাতে ছোটো ছোটো সম্প্রদায় মিলে আঞ্চলিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে— যেমন বীর শৈব ও শ্রীবৈষ্ণব। মোট কথা, নানা বৈচিত্র্যের পরিণামে হিন্দুধর্ম একশৈলিক রূপ পায়নি। রাজনৈতিক দিক থেকেও রাজপরিবারের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। (ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ)।

যাই হোক— এটা প্রমাণিত যে শংকরাচার্যের ধর্ম-অভিযানের কালে দেশের ধর্মপ্রেক্ষিতে ছিল না ঐক্য-সমন্বয়-সমৃদ্ধ পরিস্থিতি। শুধু ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, বৌদ্ধভিক্ষু-আচার্য প্রমুখরা নন— অঞ্চলের রাজা-রাজন্য ব্যক্তিদের ভূমিকাতেও ধর্ম-প্রেক্ষিত নিয়ন্ত্রিত হত। বলা

চলে ধর্ম প্রেক্ষিত খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হত। ধর্মকে কেন্দ্র করে তৈরি হত অশান্তি, নৈরাশ্য।

পৌরাণিক তথা রামায়ণ-মহাভারত, গীতা, বৌদ্ধ নানান শাস্ত্র-সবের প্রভাবে যুগের মানুষের মনে ছিল যে ধর্মভাবনা তাতে বেদ-বেদান্ত-বিহিত ঐক্যতত্ত্বের লেশমাত্র ছিল না। বেদ-বেদান্তের ঐক্যতত্ত্ব হারাতে বসেছিল বলেই দেখা গিয়েছিল বিরোধ-বৈষম্য। শংকরের ভূমিকায় বিরোধ বৈষম্য অনেকাংশেই দূর হয়। তবে এই সময়কালে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলেই যুগের মানুষরা তাঁদের পৌরাণিক ভাবনার প্রভাবে তাঁকে 'শিবের অবতার' আখ্যা দিয়েছিলেন। শিব কেন? কিংবদন্তি বলে— মর্ত্যে ধর্মজগতে সনাতন বিশুদ্ধ ধর্মের মান-মহিমার বিলুপ্তি ঘটলে তা উদ্ধারের জন্য স্বয়ং শিব অবতার রূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। শংকরাচার্য যখন শিবরূপী অবতার তখন বেদ-বিহিত ধর্ম উদ্ধারকালে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরই সম-সময়ে ভারতের মাটিতে কুমার কার্তিকেয়, প্রজাপতি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাপত্নী সরস্বতী। কুমারিল ভট্টপাদ, মণ্ডন মিত্র ও তাঁর পত্নী সরস্বতী দেবী যথাক্রমে কুমার কার্তিকেয়, ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাপত্নী সরস্বতী দেবী। শংকর, কুমারিল, মণ্ডন মিশ্র প্রমুখ যুগ-পুরুষদের ঘিরে প্রচলিত নানা পৌরাণিক গল্প-কাহিনিতে বিজ্ঞান তথা বাস্তব-মনস্ক মানুষরা বিশ্বাস-আস্থা রাখেন না। তাঁরা চান সব কিছু বাস্তবসম্মত-বিজ্ঞান পরীক্ষিত পদ্ধতির সাহায্যে জেনেবুঝে নিতে। যাঁরা পৌরাণিক তত্ত্ব মানেন, অতীন্দ্রিয়তা, অতিবাস্তবতাকে মানেন তাঁরা বলেন অবতারতত্ত্বের কথা। আর সে কারণেই শংকরের মতো যুগমহান ব্যক্তিগণ কখনও বিষ্ণুর, কখনও শিবের, কখনও বা ব্রহ্মার অবতার বলে গণ্য হয়ে থাকেন— অবতারত্বে বিশ্বাসীজনদের কাছে।

শংকরাচার্যকে বেদ-বেদান্ত-বিহিত সনাতন ধর্মের উদ্ধারকারী

বলা হয়ে থাকে। বৈদিক-বৈদান্তিক ধর্মে আছে দর্শনতত্ত্ব। যে দর্শনতত্ত্বের সারকথা জানা থাকলে তবেই জানা-বোঝা যায় ভারতের প্রাচীন ধর্মের মূল মহিমা। সেই সঙ্গে বোঝা যায়— এ ধর্ম তথা দর্শনতত্ত্বকে বাঁচানোর জন্যে কেন শংকর আত্মনিবেদিত হয়ে সব কাজ করেছিলেন।

দর্শনতত্ত্বের প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদের দুটি ভাগ— কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞাদি বিষয়ে নানা বিধান আছে। ভারতীয় তথা হিন্দুধর্মীয় পুজোপাঠ এখনও এ সব বিধান মেনে হয়ে থাকে। বেদের জ্ঞানকাণ্ড হল উপনিষদ বা বেদান্ত। বেদান্ত— যেহেতু এ অংশ বেদ-এর অন্তে মানে শেষভাগে উপস্থাপিত।

বেদতত্ত্ব স্বীকার করে যে দর্শন তা হল আস্তিক দর্শন বা বৈদিক দর্শন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি হল আস্তিক দর্শন। মীমাংসা দর্শন বেদের কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী। পূর্ব মীমাংসকরা হোম, যাগযজ্ঞ সেই সঙ্গে কর্মফলে বিশ্বাসী। মনে রাখতে হবে যে শংকরের সম সময়ে আবির্ভূত কুমারিল ভট্ট, মন্ডন মিশ্র প্রমুখ দার্শনিকরা ছিলেন পূর্ব মীমাংসা দর্শনে বিশ্বাসী। আর শংকর বেদান্ত দর্শন তথা জ্ঞান তথা অদ্বৈত ব্রহ্মসত্যে বিশ্বাসী। ব্রহ্মসত্য উপলব্ধি করতে হলে চাই ব্যক্তি-সাধকের আত্মজ্ঞান—আত্মউপলব্ধির ক্ষমতা।

পূর্ব মীমাংসাকে বলা হয়ে থাকে কর্ম মীমাংসা। আর বেদের জ্ঞানতত্ত্ব বেদান্তের বিষয় বলে বেদান্তকে বলে জ্ঞানমীমাংসা বা উত্তর মীমাংসা। তবে সাধারণভাবে পূর্ব মীমাংসা বলা হয় কর্মমীমাংসাকে আর জ্ঞান মীমাংসা তথা উত্তর মীমাংসাকে বলা হয় বেদান্ত।

পূর্ব মীমাংসকদের সঙ্গে যেমন তেমনই শংকরকে দর্শনতত্ত্ব তথা ধর্ম বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক যুদ্ধ করতে হয়েছিল নাস্তিক মানে বেদতত্ত্বে অবিশ্বাসী আচার্য, পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে। বৌদ্ধ, জৈন